Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সেলিনা আক্তার

রোলঃ 228020170

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সেলিনা আক্তার

রোলঃ 228020170

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কারবালার ইতিহাস " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সেলিনা আক্তার, আইডিঃ 228020170 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কারবালার ইতিহাস ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সেলিনা আক্তার

আইডিঃ 228020170

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:..5

১. যুদ্ধের সূচনা: 6

২. উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রতি ইয়াযিদের পত্র 8

৩. মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করায় শাবাশী দিয়ে ইয়াযিদ লিখেন: 9

৪. ইয়াযিদের কার্যক্রম 9

৫. কারবালা প্রান্তর...10

৬. হযরত হুসাইন রাঃ এর শাহাদত: 10

৭. কারবালার প্রান্তরে হুসাইনের সাথে আরও যারা নিহত হয়েছেন:......................12

৮. যুদ্ধ যেভাবে শুরু: 13

৯. আব্দুল্লাহ এর শাহাদত...17

১০. চিঠিদাতা শিয়া কুফীদের গাদ্দারী: 17

১১. হযরত হুসাইন রাঃ এর শাহাদত:...19

১২. হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র চোখে ইয়াযিদ..26

১৩. কারবালার ঘটনাকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করব? 28

১৪. হুসাইনের খুনিদের করুণ পরিণতি:..30

১৫. আশুরার অর্থ: 31

১৬. আশুরার ফজিলত: 32

১৭. আশুরার দিনে আমাদের করণীয় কি? : 34

১৮. হুসাইনের ভাষণই প্রমাণ করে যে ইয়াযীদ তাঁর হত্যার জন্য সরাসরি দায়ী নয়:
....35

১৯. হুসাইনের হত্যাকারী নির্ধারণে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত: 37

২০. তাহলে কে হুসাইনকে হত্যা করল:...38

২১. হুসাইনের হত্যায় ইয়াযীদ কতটুকু দায়ী?..38
২২. ইয়াযীদ সম্পর্কে একজন মুসলিমের ধারণা কেমন হওয়া উচিত:...................39
২৩. মুসলিম বিশ্বে কারবালার ঘটনার প্রভাব:..40
২৪. হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ:..41

ভূমিকা:

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম),
তার পরিবার এবং সকল সাহাবীর উপর।
সৌভাগ্যবান শহীদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র সায়্যেদ হেসাইন ইবন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কারবালার প্রান্তরে শহীদ হওয়াকে কেন্দ্র করে অনেক ঘটনাই প্রসিদ্ধ রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশের অনেক মুসলিমের মধ্যে এ বিষয়ে বিরাট বিভ্রান্তি রয়েছে। তাদের সকলের কথা ঘুরে ফিরে একটাই। স্বৈরাচারী, জালেম, নিষ্ঠুর ও নরপশু ইয়াযীদের হাতে এ দিনে রাসূলের দৌহিত্র ইমাম হুসাইন নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। এ জন্য এটি একটি পবিত্র দিন। বিশেষ একটি সম্প্রদায় এ দিন উপলক্ষে তাজিয়া মিছিলসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। বিষাদসিন্ধু নামক একটি উপন্যাস পড়ে বা এর কিছু বানোয়াট ও কাল্পনিক কাহিনী শুনে সুন্নি মুসলিমগণও এ বিষয়ে ধুম্রজালে আটকা পড়েছেন।জাতির ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য আজ আমি এ বিষয়ে সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য প্রকাশ করার কাজে অগ্রসর হতে বাধ্য হলাম। মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি ভূমিকা পেশ করতে চাই। মন দিয়ে ভূমিকাটি পড়লে মূল বিষয় বুঝতে সহজ হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি আরও বিশ্বাস করি যে, আমার লেখাটি পড়ে এ বিষয়ে অনেকের আকীদাহ সংশোধন হবে। আর যারা বিষয়টি নিয়ে সংশয়ে আছেন, তাদেরও সংশয় কেটে যাবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম ইবনে কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন: প্রতিটি মুসলিমের উচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র সায়্যেদ হুসাইন ইবন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কারবালার প্রান্তরে শহীদ হওয়ার ঘটনায় ব্যথিত হওয়া ও সমবেদনা প্রকাশ করা। তিনি ছিলেন মুসলিম জাতির নেতা ও ইমামদের অন্যতম।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ কন্যা ফাতেমার পুত্র ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন বিজ্ঞ সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন একধারে ইবাদাতগুজার, দানবীর এবং অত্যন্ত সাহসী বীর। হাসান ও হুসাইনের ফযীলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। অন্তর দিয়ে তাদেরকে ভালবাসা ঈমানের অন্যতম আলামত এবং নবী পরিবারের কোনো সদস্যকে ঘৃণা করা ও গালি দেওয়া মুনাফেকির সুস্পষ্ট লক্ষণ। যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত কেবল তারাই ইমাম হুসাইন বা নবী পরিবারের পবিত্র সদস্যদেরকে ঘৃণা করতে পারে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ অনুযায়ী ইমাম হুসাইন বা অন্য কারও মৃত্যুতে মাতম করা জায়েয নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল মুসলিম জাতির বিরাট একটি গোষ্ঠী ইমাম হুসাইনের মৃত্যুতে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে থাকে।

১. যুদ্ধের সূচনা:

মু'আবিয়া তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ছেলে এজিদকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচন করেন। তার বায়েত গ্রহণ করার জন্য গভর্নরদেরকে ফরমান জারি করেন। মু'আবিয়া []-এর মৃত্যুর পর হিজরি ৬০সালের রজব মাসের ১৫ তারিখ এজিদ (রহ:) খেলাফতের দায়িত্বভার হাতে নেন। আর যথাযথ ও যোগ্যতার সাথে খেলাফতের কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন।

এদিকে মদিনার অধিকাংশ মানুষ এজিদের বায়েত গ্রহণ করলেও হুসাইন বায়েত করা থেকে বিরত থাকেন। এ সুযোগে ঐ কুচক্রীদলটি কুফা থেকে হুসাইন (রঃ) কে পত্রের পর পত্র পাঠাতে থাকে। চিঠির বিষয় হলো: আমরা এজিদকে মানি না। আমরা আপনার হাতে বায়েত হব। আপনি কুফায় হাজির হয়ে আমাদের বায়েত গ্রহণ করুন। পত্রের সংখ্যা ৫০০ শতের অধিক ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।

হুসাইন [রঃ] অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য চাচাত ভাই মুসলিম ইবনে 'আকিল [কে কুফায় প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে হানী ইবনে 'উরওয়ার বাড়িতে অবস্থান করে হুসাইন [রঃ]-এর নামে বিশ হাজরের অধিক মানুষের বায়েত নেন। আর হুসাইন []-এর নিকট পত্র পাঠান যে, তাঁর নামে বায়েত গ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে, যত তাড়াতাড়ি কুফায় আগমন করুন।

এদিকে হুসাইন [রঃ] মুসলিমের পত্র পেয়ে যিলহজ্ব মাসের ৮তারিখ মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশে রওয়ানা হন। এ খবর এজিদের নিকট পৌঁছলে বাসরার আমীর উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে নির্দেশ করেন যে, তুমি বাসরার সাথে কুফারও দায়িত্ব গ্রহণ কর। অন্য দিকে কুফার সাবেক আমীর নু'মান ইবনে বাশীরকে বরখাস্ত করেন; কারণ তিনি মুসলিমকে সাহায্য করেন। এজিদ ইবনে জিয়াদকে কুফায় বিদ্রোহীদের ব্যাপারে সতর্কথাকার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু হুসাইন [] কে হত্যার জন্য কোন প্রকার নির্দেশ দেননি।

এদিকে মুসলিম ইবনে আকিল [] চার হাজার মানুষ সঙ্গে করে কুফার গভর্নর হাউসে পৌঁছে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইবনে জিয়াদ টের পেয়ে গেট বন্ধ করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। আর বিভিন্ন গোত্রের প্রধানদেরকে অর্থের বিনিময়ে মানুষকে মুসলিম ইবনে আকিল থেকে দূর করার জন্য নির্দেশ দেয়। ফলে ভাগতে থাকে একে একে অনেকে। শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে মাত্র ৩০জন। মুসলিম তাদেরকে সঙ্গে করে মাগরিবের সালাত আদায় করেন। অন্ধকার ঘনিভূত হলে মুনাফেকরা ভেগে যায় সকলে, বাকি থাকেন একা মুসলিম। শেষ পর্যন্ত মুসলিম অন্ধকারে অচেনা জায়গায় কি করবেন, কথায় যাবেন, পড়লেন মহাবিপাকে।

ওদিকে ইবনে জিয়াদ বিভিন্ন গোত্রপতিদের সঙ্গে করে নিয়ে মুসলিমের খোঁজে বের হয় এবং যে মুসলিমকে হত্যা করবে তার কোন কেসাস নেই বলে ঘোষণা করে। আর যে জিন্দা হাজির করবে তার জন্যঘোষণা করে বিশেষ পুরস্কার। শেষ পর্যন্ত মুসলিমকে ধরে ফেললে তিনি হুসাইন [রঃ] ও তাঁর পরিবারের জন্য ভীষণ কাঁদেন। পরিশেষে হত্যার পূর্বে হুসাইনের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লেখেন যে, আপনি স্বপরিবারে ফিরে যান। এখানকার মানুষ খেয়ানত করেছে। কিন্তু কুচক্রদলের লোকেরা পত্র বাহককে পথেই হত্যা করে ফেলে; যাতে করে হুসাইন [রঃ] তাঁর যাত্রা অব্যহত রাখেন। আর মুসলিমকে হত্যা করা হয় আরাফাতের দিনে।

এদিকে হুসাইন []-এর কুফার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার কথা শুনে ইবনে আব্বাস [রঃ] বলেন: আপনি তাদের নিকটে যাচ্ছেন যারা আপনার বাবা ও বড় ভাই হাসানকে হত্যা করেছে। একই কথা তাঁর বিমাতা ভাই মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াও [] বলেন। এ ছাড়া আবু সাঈদ খুদরী, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর অনেকে কুফায় যাওয়ার ব্যাপারে তাঁকে শক্তভাবে বাধা প্রদান করেন।

ইবনে উমার [রঃ] জানতে পেরে দুই বা তিন দিনের রাস্তা ঘোড়া দৌড়িয়ে পথে দেখা করে বলেন:আপনি কক্ষনো কুফায় যাবেন না। কিন্তু হুসাইন [রঃ] অস্বীকার করলে বলেন: রসুলুল্লাহ [সঃ]কে আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে এখতিয়ার করার সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি আখেরাতকে এখতিয়ার করে ছিলেন। আপনিও আহলে বাইতের মানুষ আখেরাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। এরপর তিনি তাঁকে বিদায় জানিয়ে ফিরে আসেন।

হুসাইন [রঃ] যখন জানতে পারেন যে, অবস্থা ঘোলাটে তখন ফিরে আসার চিন্তা করলে মুসলিম ইবনে আকিলের সন্তানরা [] বলেন: আমাদের বাবার প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত ফিরে যাব না।

এদিকে ইবনে জিয়াদ পরিস্থিতির মুকাবেলা করার জন্য প্রথমে হুর ইবনে এজিদ আত্তাইমীর নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্য প্রেরণ করে। পরে উমার ইবনে সা'দের নেতৃত্বে আরো চার হাজার সৈন্য পাঠায়।

অবস্থা খারাপ দেখে হুসাইন [রঃ] তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন। (১) আমাকে তোমরা মদিনায় ফিরে যেতে দাও। (২) অথবা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে দাও। (৩) আর না হয় শামে এজিদের নিকটে যেতেদাও। কিন্তু ইবনে জিয়াদ কোন প্রস্তাব না মেনে হুকুম জারি করে যে, আমার হুকুম মানতে হবে আর না হয় যুদ্ধ করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেয়।

হুসাইন [রঃ]-এর সঙ্গে ছিল মাত্র ৩০জন অশ্ববাহিনী, ৪০জন পদাতিক বাহিনী। আর আহলে বাইতের ছোট ছোট বাচ্চা ও নারীদের ১৭জন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে বাধ্য হন এবং একে একে মোট ৭২জন শহীদ হন। আর নরপশু শিম্মার ইবনে যিল জাওশানের উস্কানিতে পিচাশ খাওলা আল-আসবাহী তাঁর সিনার মধ্যে আঘাত করে এবং মালাউন সিনান ইবনে আনাস আন-নাখাঈ হুসাইন [] কে হত্যা করে।

এ ভাবেই ৬১হিজরির ১০ই মোহররম রোজ শুক্রবার কারবালার প্রান্তে ৩৩টি তীর, বর্ষা ও তালোয়ারের আঘতপ্রাপ্ত হয়ে নির্মমভাবে শহীদ হলেন হুসাইন [রঃ]। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৮বছর। এরপর শয়তানরা লুটপাট করে নেয় আহলে বাইতের সমস্ত মাল-সম্পদ।

২. উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রতি ইয়াযিদের পত্র

সে সময় ইয়াযিদ উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে ফরমান পাঠায়। তাতে লিখে যে, আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, হুসাইন রাঃ কুফার দিকে আসছেন। হুসাইন রাঃ এর বিষয়ে সব সময়ের মাঝে তোমার সময়টা, সকল শহরের মাঝে তোমার শহর, সকল গভর্ণরদের মাঝে তুমিই বড় পরীক্ষার সম্মুখীন। এমন পরীক্ষা পতিত হয়েই লোকেরা

উন্নতী অর্জন করে অথবা গোলামদের মত লাঞ্ছিত হয়ে যায়। [আলমু'জামুল কাবীর-৩/১১৫]

৩. মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করায় শাবাশী দিয়ে ইয়াযিদ লিখেন:

গোয়েন্দা এবং সশস্ত্র পাহারাদারদের সতর্ক রাখো। যাদেরই সন্দেহ হয় গ্রেফতার করো। যাদের উপর অভিযোগ আছে তাদের পাকড়াও করো। কিন্তু হত্যা কেবল তাকেই করবে, যে তোমার সাথে যুদ্ধ করে। আর আমাকে ঘটমান সকল কিছু জানাতে থাকবে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮১]

ইয়াযিদের উক্ত পত্র প্রমাণ করে যে, ইয়াযিদ হযরত হুসাইন রাঃ এর কাফেলায় স্বপ্রণোদিত হয়ে কোন প্রকার ধর-পাকড় করতে আদেশ দেননি। বরং যদি অভিযোগ পাওয়া যায়, বা সন্দেহযুক্ত কাজ করে তাহলেই কেবল পাকড়াও করবে। আর তারা যুদ্ধ না করলে তাদের সাথে হত্যার মত কাজ না করতেও নির্দেশ প্রদান করা হয়। ইয়াযিদ হয়তো ইবনে যিয়াদকে এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছে। অথচ ইবনে যিয়াদের মত পাথর দিলের মানুষের জন্য এতটুকু বলা যথার্থ ছিল না। ইয়াযিদের উচিত ছিল একথা জানানো যে, যদি খারাপ কিছুর সম্ভাবনা হয়, তাহলে যেন হযরত হুসাইন রাঃ কে নিরাপত্তার সাথে তার কাছে দামেশকে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এভাবে স্পষ্ট কিছু না বলা ইয়াযিদের অপূরণীয় ভুল বলেই প্রতীয়মান হয়েছে।

৪. ইয়াযিদের কার্যক্রম

মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করা পর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রথম প্রচেষ্টা এই ছিল যে, কুফার অবস্থা সম্পর্কে হযরত হুসাইন রাঃ কে সম্পূর্ণ বেখবর রাখা। এ লক্ষ্যে সে কুফা থেকে বসরা পর্যন্ত এবং শাম পর্যন্ত কড়া মূল রাস্তাগুলোতে এতোটাই কড়া পাহারা বসায় যে, প্রায় এক মাস জুড়ে হযরত হুসাইন রাঃ পর্যন্ত কুফার খবর জানাতে যেতে এ এলাকা অতিক্রম করতে পারেনি। আরব থেকে আসা কেউ যাচাই বাছাই ছাড়া এ এলাকায় ঢুকতে পারেনি।

মুসলিম বিন আকীলকে জিলহজ্ব মাসের ৮ তারিখ শহীদ করা হয়। এর কয়েকদিন আগেই হযরত হুসাইন রাঃ কুফার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়ে পড়েন। তার এটা জানা ছিল না যে, কুফার গভর্ণরের আসনে এখন কোমল হৃদয়ের অধিকারী নুমান বিন বশীর রাঃ নয়, বরং পাথর দিলের অধিকারী যন্ত্রমানব উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ বসে আছে। যদি এতোটা কড়া পাহারা না হতো, তাহলে হয়তো মক্কার সীমানা পাড় হবার আগেই হুসাইন রাঃ এর কাছে কুফার প্রকৃত অবস্থা জানা হয়ে যেতো। কিন্তু কড়া চেকিং এর কারণে কেউ এ সংবাদ জান্নাতের সর্দারের কানে পৌঁছাতে পারেনি। ফলে তিনি তার কাফেলা নিয়ে আগে বাড়তে লাগলেন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

৫. কারবালা প্রান্তর

হিজরী ৬১ হিজরীর ৯ই মহররম।

কারবালা প্রান্তরে সরকারী বাহিনীর অফিসার উমর বিন সা'দ, শিমার বিন জিলজাওশান এবং হুসাইন বিন নুমাইরের সাথে হযরত হুসাইন রাঃ এর আলোচনা হয়। হযরত হুসাইন রাঃ তাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের ওয়াস্তা দিয়ে বলেন,

،أَنْ يُسَيِّرُوهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَزِيدَ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ

আমাকে আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযিদের কাছে যাবার সুযোগ দিন। আমি আমার হাত তার হাতে দিয়ে দেবো।

[তারীখে তাবারী-৫/৩৯২, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৭০]

কিন্তু ইবনে যিয়াদের পক্ষ থেকে হযরত হুসাইন রাঃ কে শর্তহীনভাবে গ্রেফতার করার আদেশ ছিল। তাই সেনাপ্রধান জবাব দিল: "এছাড়া কোন পথ নেই যে, আপনি সিদ্ধান্তের জন্য নিজেকে ইবনে যিয়াদের কাছে আত্মসমর্পণ করুন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৭০]

৬. হযরত হুসাইন রাঃ এর শাহাদত:

হুসাইন রাঃ এর সাথে শ'য়ের কাছাকাছি লোক ছিল। তাদের মাঝে হযরত আলী রাঃ এর ৫ ছেলে। বনু হাশেমের ১৬ জন। বনু সালীম এবং বনু কেনানার এক এক দল ছিল। ইবনে উমর বিন যিয়াদ নামের এক ব্যক্তিও শামিল ছিল। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

অবশেষে এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সরকারী বাহিনীর হাতে হযরত হুসাইন রাঃ এর সকল সাথীবর্গ শহীদ হয়ে যান। যাদের মাঝে দশজন যুবক হুসাইন রাঃ এর নিজের ঘরের ছিলেন। এক তীর এসে হুসাইন রাঃ এর কোলের শিশুর গায়ে এসে লাগে। এতে উক্ত কোলের শিশুটিও শাহাদত বরণ করেন।

হুসাইন রাঃ শিশুটির শরীর থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের এবং তাদের মাঝে তুমিই ইনসাফ কর। ওরা আমাদের এজন্য ডেকেছে যে, তারা আমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু ওরা এখন আমাদের হত্যা করছে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

হযরত হুসাইন রাঃ এর এ দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, ওরা শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হবে না। গায়ের কাপড় খুলে বেইজ্জাত করতে চাইবে। তাই তিনি তাঁবুতে ফিরে গেলেন। বললেন, আমাকে এমন একটা কাপড় দাও, যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পছন্দ করবে না। যাতে করে কাপড় খুলে নিলেও কম দামী উক্ত চাদরটি যেন শরীরে রেখে যায়। একদম উলঙ্গ করে না ফেলে। তারপর তিনি একটি পুরাতন চাদর জামার নিচে পরিধান করলেন। তারপর তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এলেন। [আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

দিনের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইয়াযিদ বাহিনীর সৈন্যরা হযরত হুসাইন রাঃ কে হত্যার সুযোগ পেয়েও করছিল না। এর কারণ হল, তাদের কেউ হুসাইন রাঃ কে হত্যার দায় নিতে চাচ্ছিল না। একজন চাচ্ছিল অন্যজন হত্যা করুক।

অবশেষে শিমার জিলজাওশান সৈন্যদের আহবান করে বলল, তাঁকে হত্যার ব্যাপারে তোমাদের কিসের অপেক্ষা?

তখন যুরআন বিন শারীক তামীমী হুসাইন রাঃ এর দিকে অগ্রসর হয়ে কাঁধে তরবারী দ্বারা আঘাত করল। এরপর সিনান বিন আনাস আমর নাখয়ী তাঁকে বর্শা দ্বারা আঘাত করল। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে মাথা কেটে ফেলে। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/৩৫২]

হুসাইন রাঃ বীরের মত লড়তে লড়তে কারবালা প্রান্তরে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

[আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

নিকৃষ্ট খুনীরা হযরতের শরীর থেকে সকল কাপড় খুলে নেয় পুরাতন চাদরটি ছাড়া। শরীর থেকে মাথাকে আলাদা করে ফেলে।

[আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

শিমার হযরত আলী আসগর তথা যাইনুল আবেদীন রহঃ কে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন হুমায়দ বিন মুসলিম তাকে তা থেকে নিবৃত করে। কারণ, তখন তিনি অসুস্থ্য ছিলেন।

এরপর সেনাপতি উমর বিন সা'দ এসে বলল, সবাই শুনে রাখ! কেউ যেন এ মেয়েদের তাঁবুতে প্রবেশ না করে এবং এই বালককে হত্যা না করে। আর যে তাঁদের কোন সামানপত্র নিয়েছে, সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/৩৫২]

৭. কারবালার প্রান্তরে হুসাইনের সাথে আরও যারা নিহত হয়েছেন:

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্তানদের মধ্যে থেকে আবু বকর, মুহাম্মাদ, উসমান, জাফর এবং আব্বাস।

হুসাইনের সন্তানদের মধ্যে হতে আবু বকর, উমর, উসমান, আলী আকবার এবং আব্দুল্লাহ।

হাসানের সন্তানদের মধ্যে হতে আবু বকর, উমর, আব্দুল্লাহ এবং কাসেম।

আকীলের সন্তানদের মধ্যে হতে জাফর, আব্দুর রাহমান এবং আব্দুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন আকীল।

আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফরের সন্তানদের মধ্যে হতে 'আউন এবং আব্দুল্লাহ। ইতোপূর্বে উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের নির্দেশে মুসলিম ইবন আকীলকে হত্যা করা হয়। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন।

আমীন

৮. যুদ্ধ যেভাবে শুরু:

কথাবার্তা শেষ হয়ে যাবার পরও উমর বিন সা'দ যুদ্ধ না করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইবনে যিয়াদ কুফায় বসে পুরো পরিস্থিতির ক্ষণে ক্ষণে সংবাদ রাখছিল। সে কড়া নির্দেশ প্রদান করে জুআইরিয়া বিন বদর তাইমীকে পাঠায় যে, উমর বিন সা'দকে বল যে, দ্রুত হামলা করতে, নতুবা তাকে হত্যা করা হবে।
উমর বিন সা'দ সেদিন সুযোগ দিল হুসাইন রাঃ কে চিন্তা ভাবনা করার জন্য।

পরদিন উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কড়া নির্দেশ পাবার পর উমর বিন সা'দ হাতিয়ার নিল এবং যুদ্ধ শুরু করার ঘোষণা দিল। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

৬১ হিজরীর মহররম মাসের ১০ তারিখ।

শুক্রবার মতান্তরে শনিবার উমর বিন সা'দ তার সঙ্গীদের নিয়ে ফজরের নামায শেষে যুদ্ধের জন্য সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, সে দিন ছিল আশুরার দিন।

এদিকে হযরত হুসাইন রাঃ ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নামায পড়লেন। আর তারা ছিলেন বত্রিশজন অশ্বারোহী এবং চল্লিশ পদাতিক যোদ্ধা। এরপর তিনি তাঁদেরকে সারিবদ্ধ করলেন। ডানপাশের কমান্ডার বানালেন যুহাইর বিন কায়সকে আর বাম পাশের জন্য নির্ধারণ করলেন হাবীব বিন মুতাহহারকে। তাঁর ঝাণ্ডা প্রদান করলেন তাঁর ভাই আব্বাস বিন আলীকে। আর তাঁদের সঙ্গের মেয়েদেরকে তাঁবুগুলিতে তাদের পেছনে নিয়ে আসলেন।

এদিকে হুসাইন রাঃ এর নির্দেশমত রাতেই তারা তাদের তাঁবুর পেছনে পরিখা খনন করে তাতে জ্বালানি কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি ফেলে রেখেছিলেন। এরপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল। যাতে করে পেছন থেকে কেউ তাঁবুর কাছে ঘেঁষতে না পারে। আর উমর বিন সা'দ তাঁর বাহিনীর ডান পার্শের কমান্ডার বানালো আমর বিন হাজ্জাজ আয যুবাইদীকে। বাম পাশের জন্য শিমার বিন জুলজাওশানকে।

অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আযরাহ বিন কায়স আল আহমাসী। আর পদাদিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল শাবীছ বিন রিবয়ীর। আর ঝা-া ছিল ওয়ারদানের হাতে।

উভয় পক্ষ স্ব স্ব স্থানে স্থির হয়ে থাকলো। [আলবিদায়া ওয়াননিয়াহা-৮/১৭৮, আরবী, ৮/৩৩৩, বাংলা]

হুসাইন রাঃ এর গায়ে মোটা জোব্বা ছিল। উমর বিন সা'দের বাহিনীর উমর তাহয়ী নামক সৈন্য তীর ছুড়ল। তীর গিয়ে হুসাইন রাঃ এর কাঁধে এসে আঘাত করল। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

এ সময় কুফার ঘোরসওয়ার বাহিনীর কমান্ডার হুর বিন ইয়াযিদের বিবেক জাগ্রত হয়ে উঠল। সে সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধাংদেহী মনোভাব দেখে তিরস্কার করে বলতে লাগল, তোমরা কি হুসাইন রাঃ এর আবেদন গ্রহণ করবে না? আল্লাহর কসম! যদি এমন দরখাস্ত তুর্কিস্তান ও দায়লামের কাফেররাও করতো, তাহলে তা তোমাদের জন্য রদ করা জায়েজ হতো না।

এতে করে সৈন্যদের মাঝে কোন প্রভাব সৃষ্টি হয়নি। তখন তিনি বেশ নিজ বাহিনী ছেড়ে হুসাইন রাঃ এর বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাদের সাথে শরীক হয়ে গেলেন।

তার পূর্ব আচরণের জন্য হুসাইন রাঃ এর কাছে ক্ষমা চাইলেন। বলেন, আমি যদি আগে তাদের ইচ্ছের কথা জানতাম, তাহলে আমি আপনার সাথে ইয়াযিদের কাছে যেতাম।

এরপর তিনি বাহিনীর সামনে এসে উমর বিন সা'দকে বললেন, দুর্ভাগ্য! তোমাদের নবীর দৌহিত্রের প্রস্তাবিত তিনটি বিষয়ের একটিও কি তোমরা গ্রহণ করবে না? তখন সে বলল, তা গ্রহণ করার ক্ষমতা যদি আমার থাকতো, তাহলে আমি তা গ্রহণ করতাম। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৮০, ৮/৩৩৬]

তারপর যুদ্ধ শুরু হল। হুর বিন ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদের বাহিনীর উপর হামলা করলেন। দুইজন সৈন্যকে হত্যা করে নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন। [তারীখে তাবারী-৩/৩৯২]

৩) কারবালার প্রান্তরে রসূলের দৌহিত্র হোসাইন (রঃ) নিহত হওয়ার প্রকৃত ঘটনা :

কারবালা প্রান্তরে (৬০ বা ৬১ হিজরির ১০ মুহাররম) মহানবী (সা.)-এর দৌহিত্র হোসাইন (রা.)-এর মর্মান্তিক শাহাদাত বরণ 'আশুরা'কে আরো গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। ফলে কারবালা ও কারবালা সংক্রান্ত ইতিহাস জরুরি বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

কারবালা সংশ্লিষ্ট ইতিহাস সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষেপে জুবাইর ইবনে বাক্কার (রহ.) বলেন, হোসাইন ইবনে আলী (রা.) চতুর্থ হিজরির শাবান মাসের ৫ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। আর আশুরার জুমার দিনে ৬১ হিজরিতে তিনি শহীদ হন। তাকে সিনান ইবনে আবি আনাস নাখায়ি হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতা করে খাওলি ইবনে ইয়াজিদ আসবাহি হিময়ারি।

সে হোসাইন ইবনে আলীর মাথা শরীর থেকে দ্বিখণ্ডিত করে এবং ওবায়দুল্লাহর দরবারে নিয়ে যায়।

বলাবাহুল্য যে, কারবালার প্রান্তরে সে অশুভ দিনে পাপিষ্ঠরা যে নির্মমতা ও নির্দয়তার পরিচয় দিয়েছে, তা পাষণ্ড হৃদয়েও ব্যথা ও যাতনা সৃষ্টি করে।

শাহাদাতের পর হজরত হোসাইন (রা.)-এর দেহ মোবারকে মোট ৩৩টি বর্শা ও ৩৪টি তরবারির আঘাত দেখা যায়। শরীরে ছিল অসংখ্য তীরের জখমের চিহ্ন।তার সঙ্গে মোট ৭২ জনকে হত্যা করে ঘাতকরা।

হোসাইন (রা.)-এর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল খিলাফত ব্যবস্থার পুণর্জীবন। ইয়াজিদের বিরুদ্ধে কুফাবাসীর সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে হোসাইনের (রা.) স্ত্রী, ছেলে, বোন ও ঘনিষ্ঠ ২০০ অনুচর নিয়ে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কুফার উদ্দেশে রওনা হন। ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালা নামক স্থানে পৌঁছালে কুফার গভর্নর ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তাকে বাধা দেন। রক্তপাত ও খুনাখুনি বন্ধের উদ্দেশে হজরত হোসাইন (রা.) তিনটি প্রস্তাব দেন।

এক. তাকে মদিনায় ফিরে যেতে দেওয়া হোক। দুই. তুর্কি সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেওয়া হোক। তিন. ইয়াজিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য দামেস্কে পাঠানো হোক।

কিন্তু ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে তার হাতে আনুগত্যের শপথ নিতে আদেশ দেন। হজরত হোসাইন (রা.) ঘৃণা ভরে তার এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন।

অবশেষে ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী হজরত হোসাইনকে (রা.) অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং ফোরাত নদীতে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেয়। হজরত হোসাইন (রা.)-এর শিবিরে পানির হাহাকার শুরু হয়। তিনি ইয়াজিদ বাহিনীর উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, 'আমি যুদ্ধ করতে আসিনি, এমনকি ক্ষমতা দখল আমার উদ্দেশ্য নয়। খিলাফতের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার আমার কাম্য।'

ইয়াজিদ বাহিনী ১০ মুহাররম তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ অসম যুদ্ধে একমাত্র ছেলে হজরত জায়নুল আবেদিন (রহ.) ছাড়া ৭০ থেকে ৭২ জন শহীদ হন। হজরত হোসাইন (রা.) মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যান। অবশেষে তিনি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। হজরত হোসাইন (রা.)-এর ছিন্ন মস্তক বর্শা ফলকে বিদ্ধ করে দামেস্কে পাঠানো হয়। ইয়াজিদ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে ছিন্ন মস্তক প্রত্যর্পণ করলে কারবালা প্রান্তরে তাকে কবরস্থ করা হয়।

ইতিহাস সাক্ষী, হজরত হোসাইন (রা.)-কে কারবালা প্রান্তরে যারা নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে করুণ পন্থায় তাদের প্রত্যেকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।
(সূত্র: কারবালার ইতিহাস, আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.)।)

প্রসঙ্গত মনে রাখা জরুরি, আশুরা মানেই শুধু কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা নয়। আশুরার ঐতিহ্য আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে আশুরার ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, ইসলামের আবির্ভাবেরও বহু আগ থেকে।

আল্লাহ তায়ালা হজরত হোসাইন (রা.), তার পরিবার ও বন্ধুজনদের জান্নাতে চির উচ্চ মর্যাদায় আসীন করুন। আমাদের হোসাইন (রা.)-এর মতো সত্য-ন্যায়ের পথ অবলম্বনের তাওফিক দান করুন।

৯. আব্দুল্লাহ এর শাহাদত

হযরত হুসাইন রাঃ এর ছেলে আব্দুল্লাহ। অত্যান্ত সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন। এক কুফী সৈন্য তাঁকে দেখে বলল, তাকেতো আমি অবশ্যই হত্যা করবো। অন্যান্যরা বুঝাল যে, এমন ছোট্ট নাবালেগ শিশুকে হত্যা করে তোর কী ফায়দা? কিন্তু সেই কুফী তার উপর হামলা করল এবং তাকে হত্যা করল। যখন তার উপর আঘাত করছিল, তখন আব্দুল্লাহ চিৎকার বলে উঠলেন: হে চাচা! হযরত হুসাইন রাঃ আওয়াজ শুনে বলতে লাগলেন: এমন ব্যক্তির আওয়াজে লাব্বাইক, যার সাহায্যকারী কম কিন্তু শত্রু অনেক বেশি। হুসাইন রাঃ হামলাকারীর উপর আক্রমণ করে এক আঘাতে তার এক হাত এবং আরেক আঘাতে তাকে হত্যা করেন। তারপর আম লড়াই শুরু হয়ে গেল। [আলমিহান-১৫৪]

১০. চিঠিদাতা শিয়া কুফীদের গাদ্দারী:

হুসাইন রাঃ যখন কুফার বদলে দামেশক যেতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তখন কুফী শিয়ারা চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে শুরু করে। তাদের মূল মাকসাদ ছিল হুসাইন রাঃ কে ভুল বুঝিয়ে কুফায় এনে একটি হাঙ্গামা সৃষ্টি করা। কিন্তু হুসাইন রাঃ পরিস্থিতি বুঝে যান। চিঠি লেখক শিয়াদের মিথ্যাচার নিজ চোখে অবলোকন করেন। শিয়াদের লক্ষ্য করে হুসাইন রাঃ এর বক্তব্য আমরা শিয়াদের গ্রন্থ থেকে একটু দেখে নেই:

হুসাইন রাঃ কুফীদের লক্ষ্য করে বলেন, আফসোস! তোমরাতো ঐ লোক! যারা আমার পিতা হযরত আলী রাঃ কে ধোঁকা দিয়েছো। তারপর তাকে শহীদ করেছো। তারপর আমার ভাই হাসান রাঃ কে আহত করেছো। আমার চাচাতো ভাই মুসলিম আকীল রাঃ কে কুফায় কতল করেছো। সত্য কথা হলো, যারাই তোমাদের প্রতারণায় ফেঁসে গেছে তারা বড় আহমক। [জালাউল উয়ূন।

হুসাইন রাঃ বলেন,

হে জনতা! তোমরা যেন ধ্বংস হও। দুর্দশাগ্রস্ত হও। তোমরা উৎসাহের সাথে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে তোমাদের সাহায্য করার জন্য এবং আমরা তা করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু তোমরা এখন সে তরবারিগুলো কোষমুক্ত করেছো যা আমরা

তোমাদের দিয়েছি এবং তোমরা আমাদের জন্য আগুন জ্বালিয়েছো যা আমরা তোমাদের ও আমাদের শত্রুদের জন্য জ্বালিয়েছিলাম। তোমরা তোমাদের শত্রুদের পক্ষ নিয়েছো এবং তাদের সাথে থেকে তোমাদের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হয়েছো। [শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস-১/১৯৯-২০০]

হুসাইন রাঃ এর আরেকটি বক্তব্য আসছে শিয়াদের গ্রন্থে:

হে কুফার লোকেরা, তোমাদের মায়েরা তোমাদের হারাক। তোমরা আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে, এরপর যখন তিনি তোমাদের কাছে এলেন, তোমরা তাকে শত্রুর হাতে তুলে দিলে। অথচ তোমরা তার জীবন রক্ষার্থে জীবন দিতে

চেয়েছিলে। এখন তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছো তাকে হত্যা করার জন্য। তোমরা তাকে আটক করেছো এবং তার জামার কলার ধরেছো এবং তাকে চারদিক থেকে ঘেরাও করেছো যেন তিনি আল্লাহর প্রশস্ত শহরগুলোতে পালিয়ে যেতে না পারেন।

[শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস-১/২০৭-২০৮]

হযরত হুসাইন রাঃ চিঠি প্রদান করে কুফায় দাওয়াতদাতা এসব শিয়া নামধারী গাদ্দারদের পল্টিবাজী দেখে দামেশক যাবার মনস্ত করেন। কিন্তু এসব গাদ্দাররা তখন তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবার আতংকে পড়ে যায়। কারণ, হুসাইন রাঃ এর সাথে তাদের চিঠি ছিল। যাতে তাদের নামও ছিল। যারা হুসাইন রাঃ কে কুফায় এসে তাদের বাইয়াত নিয়ে বিদ্রোহ করার প্ররোচনা দিয়েছিল। এখন দামেশকে গিয়ে এসব ইয়াযিদকে দেখালে এসব চিঠি লেখকরা সব রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিচারের মুখোমুখি হবে। তাই তারা কিছুতেই চাচ্ছিল না যে, হুসাইন রাঃ দামেশকে যান। তাই তারা দ্রুতই হুসাইন রাঃ এর দলত্যাগ করে তাকে হত্যায় সহযোগিতা শুরু করে। যাতে করে তাদের গাদ্দারীর প্রমাণ বাকি না থাকে।

কুফার কিছু লোকেরা কারবালা প্রান্তরের বিভিন্ন উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখছিল। হুসাইন রাঃ এর সহায়তার জন্য আল্লাহর কাছে দুআও করতে ছিল। যেন আসমান থেকে সাহায্য এসে হুসাইন রাঃ কে উদ্ধার করে। কিন্তু নিজেরা কিছুই করতে রাজী নয়। তখন একজন ওদের বলে যে, আরে আল্লাহর দুশমনেরা! একটু নিচে এসে হুসাইন রাঃ কে সাহায্য করছো না কেন? কিন্তু তারা কোন উত্তরও না দিতে পারলো না। সাহায্য করতে এগিয়েও এলো না। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

১১. হযরত হুসাইন রাঃ এর শাহাদত:

হুসাইন রাঃ এর সাথে শ'য়ের কাছাকাছি লোক ছিল। তাদের মাঝে হযরত আলী রাঃ এর ৫ ছেলে। বনু হাশেমের ১৬ জন। বনু সালীম এবং বনু কেনানার এক এক দল ছিল। ইবনে উমর বিন যিয়াদ নামের এক ব্যক্তিও শামিল ছিল। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

অবশেষে এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সরকারী বাহিনীর হাতে হযরত হুসাইন রাঃ এর সকল সাথীবর্গ শহীদ হয়ে যান। যাদের মাঝে দশজন যুবক হুসাইন রাঃ এর নিজের ঘরের ছিলেন। এক তীর এসে হুসাইন রাঃ এর কোলের শিশুর গায়ে এসে লাগে। এতে উক্ত কোলের শিশুটিও শাহাদত বরণ করেন। হুসাইন রাঃ শিশুটির শরীর থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের এবং তাদের মাঝে তুমিই ইনসাফ কর। ওরা আমাদের এজন্য ডেকেছে যে, তারা আমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু ওরা এখন আমাদের হত্যা করছে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

হযরত হুসাইন রাঃ এর এ দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, ওরা শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হবে না। গায়ের কাপড় খুলে বেইজ্জাত করতে চাইবে। তাই তিনি তাঁবুতে ফিরে গেলেন। বললেন, আমাকে এমন একটা কাপড় দাও, যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পছন্দ করবে না। যাতে করে কাপড় খুলে নিলেও কম দামী উক্ত চাদরটি যেন শরীরে রেখে যায়। একদম উলঙ্গ করে না ফেলে। তারপর তিনি একটি পুরাতন চাদর জামার নিচে পরিধান করলেন। তারপর তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এলেন। [আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

দিনের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইয়াযিদ বাহিনীর সৈন্যরা হযরত হুসাইন রাঃ কে হত্যার সুযোগ পেয়েও করছিল না। এর কারণ হল, তাদের কেউ হুসাইন রাঃ কে হত্যার দায় নিতে চাচ্ছিল না। একজন চাচ্ছিল অন্যজন হত্যা করুক। অবশেষে শিমার জিলজাওশান সৈন্যদের আহবান করে বলল, তাঁকে হত্যার ব্যাপারে তোমাদের কিসের অপেক্ষা? তখন ঘুরআন বিন শারীক তামীমী হুসাইন রাঃ এর দিকে অগ্রসর হয়ে কাঁধে তরবারী দ্বারা আঘাত করল। এরপর সিনান বিন আনাস আমর নাখয়ী তাঁকে বর্শা দ্বারা আঘাত করল। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে মাথা কেটে ফেলে।

[আলবিদায়াওয়াননিহায়া-৮/৩৫২]

হুসাইন রাঃ বীরের মত লড়তে লড়তে কারবালা প্রান্তরে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

[আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯)

নিকৃষ্ট খুনীরা হযরতের শরীর থেকে সকল কাপড় খুলে নেয় পুরাতন চাদরটি ছাড়া। শরীর থেকে মাথাকে আলাদা করে ফেলে।

[আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

শিমার হযরত আলী আসগর তথা যাইনুল আবেদীন রহঃ কে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন হুমায়দ বিন মুসলিম তাকে তা থেকে নিবৃত করে। কারণ, তখন তিনি অসুস্থ্য

ছিলেন। এরপর সেনাপতি উমর বিন সা'দ এসে বলল, সবাই শুনে রাখ! কেউ যেন এ মেয়েদের তাঁবুতে প্রবেশ না করে এবং এই বালককে হত্যা না করে। আর যে তাঁদের কোন সামানপত্র নিয়েছে, সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়।

[আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/৩৫২]

শুহাদায়ে কারবালা

কারবালা প্রান্তরে হযরত হুসাইন রাঃ এর সাথে আবু তালেবের পরিবারের ১৮ জন ব্যক্তি শহীদ হন।

৬ জন হুসাইন রাঃ এর ভাই। যথা- ১) আব্বাস। ২) জা'ফর।

৩) উবায়দুল্লাহ। ৪)

উসমান। ৫) মুহাম্মদ। ৬) আবু বকর।

২ জন হুসাইন রাঃ এর ছেলে। যথা ১) আব্দুল্লাহ। ২) আলী আকবর।

৩ জন হাসান রাঃ এর এর ছেলে। যথা- ১) কাসেম। ২) আবু বকর। ৩) আব্দুল্লাহ।

৩ জন আকীল বিন আবী তালেব রাঃ এর ছেলে (মুসলিম বিন আকীল রাঃ এর ভাই)।

যথা- ১) জা'ফর। ২) আব্দুর রহমান। ৩) আব্দুল্লাহ।

২ জন আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বিন আবী তালেব রাঃ এর ছেলে। যথা- ১) আউন। ২)

মুহাম্মদ।

২ জন আকীল রাঃ এর নাতি। যথা- ১) আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম। ২) মুহাম্মদ বিন আবী

সাঈদ বিন আকীল।

উমর বিন সাঈদের সৈন্যদের ৮৮ জন নিহত হয়। [তারীখে খলীফা ইবনে খাইয়্যাত-

২৩৪-২৩৫, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-১১/৫৫১-৫৫২]

হুসাইন রাঃ এর ছেলে আলী বিন হুসাইন তথা যাইনুল আবেদীন অসুস্থ্য ছিলেন। উমর বিন সা'দ সৈন্যদের বলল, তাকে যেন কিছু না করা হয়।

(তারীখুল কাবীর লিইবনে আবী খায়ছামা-২/৯১৪]

৪) কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ধারণা ঠিক নয়:

হুসাইন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুতে আকাশ থেকে রক্তের বৃষ্টি হওয়া, সেখানের কোনো পাথর উঠালেই তার নীচ থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া এবং কোনো উট জবাই করলেই তা রক্তে পরিণত হয়ে যাওয়ার ধারণা মিথ্যা ও বানোয়াট। মুসলিমদের আবেগ ও অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এ সমস্ত বানোয়াট ঘটনা বলা হয়ে থাকে। এগুলোর কোনো সহীহ সনদ নেই।

৬) হুসাইনের বের হওয়া ন্যায় সংগত ছিল কি?

বিজ্ঞ সাহাবীদের মতে কুফার উদ্দেশ্যে হুসাইনের বের হওয়াতে কল্যাণের কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নি। এ জন্যই অনেক সাহাবী তাঁকে বের হতে নিষেধ করেছেন এবং তাঁকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি বিরত হন নি। কুফায় যাওয়ার কারণেই ঐ সমস্ত জালেম ও স্বৈরাচারেরা রাসূলের দৌহিত্রকে শহীদ করতে সক্ষম হয়েছিল। তার বের হওয়া এবং নিহত হওয়াতে যে পরিমাণ ফিতনা ও ফসাদ সৃষ্টি হয়েছিল, মদিনায় অবস্থান করলে তা হওয়ার ছিল না। কিন্তু মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালা ও তকদীরের লিখন বাস্তবে পরিণত হওয়া ছাড়া ভিন্ন কোনো উপায় ছিল না। হুসাইনের হত্যায় বিরাট বড় অন্যায় সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু তা নবীদের হত্যার চেয়ে অধিক ভয়াবহ ছিল না। আল্লাহর নবী ইয়াহ-ইয়া আলাইহিস সালামকে পাপিষ্ঠরা হত্যা করেছে। জাকারিয়া আলাইহিস সালামকেও তাঁর জাতির লোকেরা নির্মমভাবে শহীদ

করেছে। এমনি আরও অনেক নবীকে বনী ইসরাইলরা কতল করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

- قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ

-
- صَادِقِينَ] (آل عمران:١٨٣]

"তুমি তাদের বলে দাও, তোমাদের মাঝে আমার পূর্বে বহু রসূল নিদর্শনসমূহ এবং তোমরা যা আবদার করেছ তা নিয়ে এসেছিলেন, তখন তোমরা কেন তাদেরকে হত্যা করলে যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক।" (সূরা আলে-ইমরান: ১৮৩)

এমনভাবে উমর, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং তাঁর হত্যা কাণ্ড নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার কোনো যুক্তি নেই।
হুসাইনকে আব্দুল্লাহ ইবনু জাফরের চিঠি

আব্দুল্লাহ ইবন জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন জানতে পারেন, হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু কুফার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন, তখনই তার নামে একটি চিঠি লেখেন।

তার ছেলের হাতে চিঠিটি দিয়ে বলেন, 'তুমি এখনই রওনা হয়ে যাও। দ্রুত গিয়ে এ চিঠিটি হুসাইনের হাতে পৌঁছে দাও।'

আব্দুল্লাহ ইবনু জাফরের পাঠানো চিঠির ভাষ্য ছিল এমন-

'হুসাইন, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে বলছি-আমার চিঠি পাওয়ামাত্রই আপনি মক্কায় ফিরে আসুন। আমি এটা আপনার কল্যাণকামী হিসেবে বলছি। আমার এ বলাটা কোনো নির্দেশ নয়। আমি আপনার ক্ষতির আশঙ্কা করছি। হয়তো আপনাকে আপনার পরিবার ও সাথিসঙ্গী-সহ শেষ করে দেওয়া হবে! আল্লাহ না করুন, যদি আপনি এ যাত্রায় ক্ষতির মুখে পড়েন বা শেষ হয়ে যান, তাহলে গোটা পৃথিবীর আলো নিভে যাবে। কেননা আপনিই মুসলিমদের আশার শেষ বাতিঘর। আপনি চলার গতি ধীর করুন। এ চিঠি আপনার কাছে পৌঁছার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আসছি। আমার জন্য অপেক্ষা করুন। আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক!'

চিঠিটি পাঠিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু জাফর মক্কার গভর্নর আমর ইবনু সাইদের কাছে যান। তাকে বলেন, 'হুসাইনের জন্য একটি নিরাপত্তানামা লিখে দাও। সেইসাথে এ আশ্বাসের কথাও লিখে দাও-তিনি মক্কায় ফিরে এলে তার সাথে ভালো আচরণ করা হবে।'

নিরাপত্তানামা লিখে দেয় আমর ইবনু সাইদ। আব্দুল্লাহ ইবনু জাফরের সাথে তার ভাই ইয়াহইয়া ইবনু সাইদকেও পাঠায় হুসাইনের কাছে। তারা গিয়ে মাঝপথে হুসাইনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আমর ইবনু সাইদের চিঠিও পড়ে শোনানো হয় তাকে। ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও করা হয়।

হুসাইন তখন তাদের সামনে ব্যাখ্যা করেন, কুফায় যাওয়ার ব্যাপারে তার সুদৃঢ় সংকল্প এবং এর ওপর অবিচল থাকার কারণ।

১] আল-কামিল ফিত তারিখ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৫০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৫১০

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৫০-১৫১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড: ১১, পৃষ্ঠা:

হুসাইনের বিরুদ্ধে ইবনু যিয়াদের প্রস্তুতি

ইয়াযিদ কুফার গভর্নর হিসেবে ইবনু যিয়াদকে নিয়োগ দেয়। কারণ সে জানত, ইবনু যিয়াদ হুসাইনের মোকাবেলায় কখনো পিছপা হবে না। তাকে দমন করতে যা কিছু করা দরকার, তার সবই সে করবে। ইবনু যিয়াদও তার কাজকর্মে এর প্রমাণ দেখায়।

হুসাইন তার সাথিদের নিয়ে কুফায় আসছেন, ইবনু যিয়াদ এ খবর পেয়ে যায়। তখনই সে তার পুলিশ প্রধান হুসাইন ইবনু তামিমকে কাদিসিয়ার উদ্দেশে পাঠিয়ে দেয়। তাকে এ নির্দেশ দেয়, 'তুমি এখনই কাদিসিয়ায় যাও। সেখানে পৌঁছে হুসাইনের মোকাবেলার প্রস্তুতি নাও।'

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন হাজির নামক স্থানে পৌঁছান, তখন তার বিশেষ দূত কাইস ইবনু মুসহিরের হাতে কুফাবাসীর কাছে একটি আগাম চিঠি পাঠিয়ে দেন। চিঠিতে হুসাইন তার আগমনি-সংবাদ জানান; সেইসাথে এর আগে কুফাবাসী তাকে যে উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, সেই কাজে তাদের পূর্ণ সমর্থনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।[২]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৫০, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৫১২

[২] তারিখুত তাবারি, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩৯৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৫১৩

হুসাইনের স্বপ্নে নবিজি

দিনটি ছিল মুহাররম মাসের ৯ তারিখ। শিমর ময়দানে হাজির হয়। হুসাইন রাযিয়াল্লাহ আনহু তখন তাঁবুর সামনে বসা। এ অবস্থায় তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। হঠাৎই জোরে শব্দ করে জাগ্রত হয়ে যান।

আওয়াজ শুনে দৌড়ে আসেন বোন যাইনার রাযিয়াল্লাহু আনহা। চিৎকারের কারণ জিজ্ঞেস করেন।

হুসাইন বলেন, 'এইমাত্র আমি নানাজান আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে বলেছেন, হুসাইন, খুব দ্রুতই তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।'

এটক শুনেই আকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করেন বোন যাইনাব। হুসাইন রাযিয়াল্লাহ আনহু তাকে সান্ত্বনা দেন। খি

তখনই দেখা যায় শিমরের বাহিনীকে। তারা এসে হুসাইনের সামনে উপস্থিত হয়। আব্বাস ইবন আলি তাদের মোকাবেলায় এগিয়ে যান। তার সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কথাবার্তা বলে। তখনই শিমর যুদ্ধের ঘোষণা দেয়।

আব্বাস চলে আসেন হুসাইনের কাছে। এ খবর তাকে জানান।

[১] তারিখুত তাবারি, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪১৫, আল-কামিল ফিত তারিখ, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৬৫

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৬৫

১২. হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র চোখে ইয়াযিদ

ইতিহাস বলে, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, পুত্র ইয়াযিদ খিলাফতের গুরু দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় শর্ত ও যোগ্যতার পূর্ণ অধিকারী। এবং এ বিশ্বাসে পরিচালিত হয়েই ইয়াযিদকে তিনি মনোনয়ন দিয়েছিলেন। কেননা-

১. হযরত উসমান-তনয় সাঈদের অনুযোগের উত্তরে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! তোমার এ দাবী যথার্থ যে, তোমার পিতা আমার চেয়ে উত্তম এবং রাসূলুল্লাহর নিকটতর ছিলেন। আর তোমার মাও ইয়াযিদের মায়ের চেয়ে উত্তম ছিলেন। কিন্তু ইয়াযিদ সম্পর্কে আমাকে বলতেই হবে যে, গোটা ভূখণ্ড তোমার মত লোকে ভরে গেলেও ইয়াযিদের যোগ্যতার পাল্লা ভারী হবে।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র এ মন্তব্য পরিষ্কারভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, রক্ত-সম্পর্ক নয়, যোগ্যতাই ছিলো ইয়াযিদকে মনোনয়ন দানের মাপকাঠি।

২. এক খোতবায় আম্মানের দিকে তাকিয়ে তিনি দু'আ করেছিলেন-'হে আল্লাহ। খিলাফতের যোগ্য বিবেচনা করেই যদি তাকে মনোনয়ন দিয়ে থাকি তাহলে তার অনুকূলে আমার এ সিদ্ধান্তকে তুমি পূর্ণতা দান করো। পক্ষান্তরে পুত্রের প্রতি পিতার মোহই যদি হয় এর কারণ, তাহলে তুমি তা ব্যর্থ করে দাও।'

৩. অন্য এক খোতবায় তিনি বলেছিলেন-

'হে আল্লাহ! ইয়াযিদকে যদি তার যোগ্যতার কারণেই মনোনীত করে থাকি, তাহলে সে মর্যাদায় তাকে উন্নীত করো এবং তাকে মদদ করো। আর যদি পুত্রের প্রতি পিতার

সহজাত ভালোবাসাই এ কাজে আমাকে প্ররোচিত করে থাকে, তাহলে আগে ভাগেই তাকে তুমি তুলে নাও।'

(যাহাবীকৃত তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম খঃ ২ পৃঃ ২৬৭, সুয়ূতীকৃত তারীখুল খুলাফা পৃঃ ১৪৯)

ভেবে দেখুন; যে বাবার মনে 'চোর' লুকিয়ে আছে, তিনি কি জুমু'আর দিনে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে দু'আ কবুলের নাযুকতম মুহূর্তে পুত্রের নামে এরূপ কঠিন দু'আ কখনো করতে পারেন?

ইয়াযিদের যে ঘৃণ্য চিত্র সাধারণতঃ আমাদের সবার চিন্তায় বদ্ধমূল হয়ে আছে, তার বুনিয়াদ হলো কারবালার মর্মন্তন ঘটনা। বস্তুতঃ রাসূল-দৌহিত্রের মর্মান্তিক শাহাদাতের সাথে কিপিং পরিমাণে হলেও যে নরাধম জড়িত, ইসলামী খিলাফতের পবিত্র আসনে মুহূর্তের জন্যও তাকে কল্পনা করা কোন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। কিছু ঘটনার নিরপেক্ষ পর্যালোচনাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ইয়াযিদকে যখন মনোনয়ন দেয়া হচ্ছিলো, তখন কিন্তু কারবালা-ট্রাজেডির অস্তিত্ব ছিলো না। এমন কি পরবর্তীকালের দোষ-ত্রুটিগুলোও ইয়াযিদ-চরিত্রে তখন বিদ্যমান ছিলো না। তখন তো সে আমীরুল মুমিনীনের প্রিয় পুত্র ও ছাহাবীজাদ্য হিসাবে সকলের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলো এবং তার নৈতিকতা, ধার্মিকতা, পারিবারিক সম্ভ্রান্তি, প্রশাসনিক দক্ষতা ও সমর নৈপুণ্যের বিচারে তাকে খিলাফতের যোগ্য বিবেচনা করার যথেষ্ট অবকাশও ছিলো। তদুপরি ইয়াযিদের এ যোগ্যতা শুধু যে পিতা মু'আবিয়া (রা)-র চোখেই ধরা পড়েছিলো তা নয়। বহু নেতৃস্থানীয় ছাহাবা ও তাবেয়ীনও অনুরূপ মত পোষণ করতেন। হিজরী দ্বিতীয় শতকের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল্লামা বালাযারী, মাদাইনীর সূত্রে ইমামুল মুফাস্সিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস সম্পর্কে বর্ণনা করেন-

'পানাহারের এক মজলিসে হযরত মু'আবিয়ার মৃত্যুসংবাদ শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। পরে বললেন, হে আল্লাহ! মু'আবিয়াকে করুণা করো, পূর্ববর্তীদের তুলনায় তিনি উত্তম ছিলেন না বটে, তবে পরবর্তীরাও তাঁর তুলনায় উত্তম হবে না। ইয়াযিদ অবশ্যই তাঁর খান্দানের যোগ্য উত্তরসূরী। সুতরাং তোমরা স্ব স্ব স্থানে থেকে তাকে আনুগত্য ও বাইআত দান করো।

'হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর অন্তরে অন্যদের ডিঙ্গিয়ে ইয়াযিদকে খলীফা মনোনীত করার যে তাগাদা সৃষ্টি হয়েছিলো, তার কারণ ছিলো উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থ। কেননা বনু উমাইয়ার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ইয়াযিদের ব্যাপারে সংঘবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। স্বগোত্র ছাড়া অন্য কারো নেতৃত্ব তারা মেনে নিতে রাজী ছিলো না। আর উমাইয়ারাই ছিলো তখন কোরাইশের প্রধান শক্তি। তাছাড়া উম্মাহর গরিষ্ঠ অংশ ছিলো তাদের অনুবর্তী। এসব দিক বিবেচনা করেই যোগ্যতরের পরিবর্তে যোগ্যকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

১৩. কারবালার ঘটনাকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করব?

যে মুসলিম আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য হুসাইনের নিহত হওয়ার ঘটনা স্মরণ করে বিলাপ করা, শরীর জখম করা, গাল, মাথা ও বুক থাবড়ানো বা এ রকম অন্য কিছু করা জায়েয নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

ليس منا من لطم الخدود و شق الجيوب

"যে ব্যক্তি মুসীবতে পড়ে নিজ গালে চপেটাঘাত করল এবং শরীরের কাপড় ছিঁড়ল, সে আমাদের দলের নয়।" (বুখারী)

তিনি আরও বলেন: "মুসীবতে পড়ে বিলাপকারী, মাথা মুণ্ডনকারী এবং কাপড় ও শরীর কর্তনকারীর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

إن النائحة إذا لم تتب فإنها تلبس يوم القيامة درعاً من جرب و سربالاً من قطران

"মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপকারী যদি তওবা না করে মারা যায়, তাকে কিয়ামতের দিন খাঁজলীযুক্ত কোর্তা পরানো হবে এবং আলকাতরার প্রলেপ লাগানো পায়জামা পরানো হবে।” (মুসলিম)

তিনি আরও বলেন

أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة

"আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলী যুগের চারটি স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে। তারা তা ছাড়তে পারবে না। (১) বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা, (২) মানুষের বংশের নাম তুলে দুর্নাম করা, (৩) তারকারাজির মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা এবং (৪) মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা।

তিনি আরও বলেন:

"মানুষের মাঝে দুটি জিনিষ রয়েছে, যা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের বংশের বদনাম করা এবং মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা।"

(মুসলিম)

তিনি আরও বলেন:

النياحة من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا ماتت و لم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران و درعاً من لهب النار

"মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা জাহেলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। বিলাপকারী যদি তওবা না করে মারা যায়, তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ

আলকাতরার প্রলেপ লাগানো জামা পরাবেন এবং অগ্নি শিখা দ্বারা নির্মিত কোর্তা পরাবেন।” (ইবনে মাজাহ)

একজন বিবেকবান মুসলিমের উপর আবশ্যক হচ্ছে সে এ ধরণের মুসীবতের সময় আল্লাহর নির্দেশিত কথা বলবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾]البقرة :١٥٦[

"যখন তাঁরা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।"

(সূরা বাকারাঃ ১৫৬)

হুসাইনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলী ইবন হুসাইন, মুহাম্মাদ এবং জাফর জীবিত ছিলেন। তাদের কেউ হুসাইনের মৃত্যুতে মাতম করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তারা ছিলেন আমাদের হেদায়েতের ইমাম ও আদর্শ।

বিলাপ করা, গাল ও বুকে চপেটাঘাত করা বা এ জাতীয় অন্য কোনো কাজ কখনই ইবাদাত হতে পারে না। আশুরার দিন।

ক্রন্দনের ফযীলতে যে সমস্ত বর্ণনা উল্লেখ করা হয় তার কোনটিই বিশুদ্ধ নয়। বিলাপ করা জাহেলী জামানার আচরণ বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন।

১৪. হুসাইনের খুনিদের করুণ পরিণতি:

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের ময়দানে পানির পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েন। একটু পানিপানের আশায় খুব কষ্টে পৌঁছান ফুরাত নদীর পাড়ে। পানি পান করতে যাবেন, সেই মুহূর্তে তার দিকে তির নিক্ষেপ করে পাষণ্ড হুসাইন ইবনু নুমাইর। তিরটি এসে তার মুখে লাগে। তখন অজান্তেই মুখ দিয়ে বদদুআ বেরিয়ে আসে-

'হে আল্লাহ, আপনার নবির দৌহিত্রের প্রতি যত জুলুম করা হচ্ছে, সবকিছুর অভিযোগ আপনার কাছে পেশ করছি। আপনি এ জালিমদের বেছে বেছে হত্যা করুন। টুকরো টুকরো করে ফেলুন তাদের। এদের একজনও যেন রেহাই না পায়! 'খি

এমনিতেই তিনি মজলুম, তার ওপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৌহিত্র-তাই তার এ বদদুআ বিফল হওয়ার সুযোগ নেই। হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ দুআ

কবুল হয়। তার হত্যাকারীদের পৃথিবীতেই সমুচিত শাস্তি মিলে যায়। আর আখিরাতের শাস্তি তো রয়েছেই।

ইমাম যুহরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যারা হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল, তাদের একজনও প্রাণে বাঁচতে পারেনি; পৃথিবীতে সবাইকেই শাস্তি পেতে হয়েছে। কেউ হয়েছে হত্যার শিকার। কারও চেহারা হয়ে গেছে কালো, কারও-বা হয়ে গেছে বিকৃত; কেউ-বা হারিয়েছে কর্তৃত্ব ও শাসনক্ষমতা। কিছুদিনের ভেতরেই এসব ঘটেছে। এগুলোর কিছুই তাদের মূল শাস্তি নয়, নমুনামাত্র। পৃথিবীবাসীকে দেখানোর জন্য যে মঞ্চস্থ হয়েছে এসব, এটা তো কারও অজানা নয়!'[0]

[১] নবি-পরিবারের শহিদদের সংখ্যা ৩৩ ছিল, এমনটা কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় না। সর্বোচ্চ ২৭ জন শহিদের কথা বলা হয়েছে, যা মুহাম্মাদ ইবনু মুসা আল-খাওয়ারিযমি উল্লেখ করেছেন।

(আল-জাববু ওয়াল রাবালা খাওয়ারিযমি, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭-৮

আল-কামিল ফিত তারিখ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৮১

অস-সওয়াইকুল মুহরিকা, ইবনু হাজার আল-হাইতামি, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৭২)

১৫. আশুরার অর্থ:

আশুরা শব্দটি শুনতেই সাধারণ মানুষের যেন গা শিউরে ওঠে; কারণ আশুরা বলতেই তাদের ধারণা কারবালা। আর কারবালা অর্থ নবী []-এর নাতি ইমাম হুসাইন ইবনে আলী []-এর স্বপরিবারে মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা। কিন্তু আসলে আশুরা অর্থ চন্দ্র বছরের প্রথম মাস মোহররমের দশম তারিখ। আল্লাহ তা'য়ালা ১২টি মাসের মাঝে ৪টি মাস যথা: যিলকদ, জিলহজ্ব, মোহররম, ও রজবকে হারাম তথা সম্মানিত মাস করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ .الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ التوبة

"নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি হারাম-সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান;
সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না।" [সূরা তাওবা:৩৬]

আর গুরুত্বপূর্ণ দশটি জিনিস এ দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আশুরা নামকরণ হয়েছে; মনে করার কোন সঠিক প্রমাণ নেই।

১৬. আশুরার ফজিলত:

হিজরি সালের ১২টি মাসের মধ্যে চারটি হারাম মাস। যিলকদ, যিলহজ্ব, মোহররম ও রজব। শুরু হারাম মাস মোহররম ও শেষ হারাম মাস যিলহজ্ব এবং মধ্যখানে হারাম মাস রজব। আরবরা মোহররম মাসকে "স্বফরুল আওয়াল" তথা প্রথম সফর নাম রেখে যুদ্ধকে তাদের ইচ্ছামত হালাল ও হারাম করতো। আল্লাহ তা'য়ালা ইহা বাতিল করে দিয়ে তার ইসলামি নামকরণ করলেন আল-মুহাররাম। তাই গুরুত্বের জন্য মোহররম মাসকে "শাহরুল্লাহিল মুহাররাম" তথা আল্লাহর মোহররম মাস বলা হয়েছে।

আশুরার দিন নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এ দিন আমাদেরকে এক ঐতিহাসিক ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বীন হেফাজতের উদ্দেশ্যে হিজরত ও হক প্রতিষ্ঠার জন্য এক মহান দিন।

আর এ জন্যই দিনটিকে বিশেষ এক ইবাদত-রোজার সাথে স্মরণ করা প্রতিটি মুসলিমের উচিত।

একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট যে, মূসা [আঃ] ও তাঁর জাতি বনি ইসরাঈল ফেরাউনের অন্যায়-অত্যাচার, নিষ্পেষণের জাঁতাকল ও গোলামী থেকে মিশর ছেড়ে সাগর পার হয়ে এ দিনে নাজাত পেয়েছিলেন। তাই আল্লাহর শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞার্থে এ দিনে রোজা রেখেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে বনি ইসরাঈলরাও রোজা রাখত।

এটি একটি গুরুত্বপূণ দিন, যার ফজিলত ও তাৎপর্য অধিক। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হলো:

(ক) এ দিনে মূসা [আঃ] ও বনি ইসরাঈলের নাজাত ও ফেরাউন ও তার জাতির ধ্বংস:

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসুল মূসা [আঃ] ও বনি ইসরাঈলকে ফেরাউনের জুলুম থেকে এ দিনে নাজাত দেন এবং ফেরাউন ও তার জাতিকে বাহরে কালজুম তথা লহিত সাগরে ডুবিয়ে হালাক-ধ্বংস করেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

"আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরাউনের লোকদিগকে তোমাদের চোখের সামনে।" [সূরা বাকারা: ৫০]

. ইবনে আব্বাস [রঃ] থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ [] যখন মদিনায় আগমন করলেন তখন দেখলেন যে, ইহুদিরা আশুরার রোজা পালন করে। তখন তিনি [] তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমরা এ দিনে কেন রোজা রাখ?" তারা বলল: এটা এক মহান দিবস। এ দিনে আল্লাহ মুসা [আঃ] ও তার জাতিকে নাজাত দেন এবং ফেরাউন ও তার জাতিকে ডুবিয়ে হালাক-ধ্বংস করেন। তাই মুসা [রঃ] ও তাঁর জাতি এদিনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে রোজা রাখেন এ জন্যে আমরাও রাখি।

রসুলুল্লাহ [সঃ] বললেন: "আমরা মূসা [আঃ]-এর অনুসরণ করার বেশি হকদার।" এরপর তিনি [] আশুরার রোজা রাখেন এবং সাহাবাগণকেও রোজা রাখার জন্য নির্দেশ করেন।'

১.(বুখারী হাঃ নং ২০২৪ ও ৩৩৯৭ মুসলিম ১১৩০ ও ১২৮ শব্দ তারই)

১৭. আশুরার দিনে আমাদের করণীয় কি? :

সুন্নি মুসলিমগণ এই দিনে রোযা রাখেন। কারণ এটি এমন একটি দিন যাতে আল্লাহ তা'আলা মুসা ও তাঁর জাতির লোকদেরকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফেরাউন সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মনে করেন, খালেস দিলে রোযা অবস্থায় হুসাইনের জন্য দো'আ করা জাহেলী জামানার আচরণের মত মাতম ও বিলাপ করার চেয়ে অনেক উত্তম। এ দিনে রোযাদারের জন্য দুটি কল্যাণ রয়েছে। একটি হচ্ছে সম্মানিত দিনে রোযা রাখার ফযিলত আর অন্যটি হচ্ছে,

রোযা অবস্থায় দো'আ করার ফযিলত। এই দো'আর একটি অংশ বা সম্পূর্ণটাই তিনি ইচ্ছা করলে হুসাইনের জন্য করতে পারেন।

আশুরার দিনে রোযা রাখার ফযীলতে যা বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا يَعْنِي عَاشُورَاءَ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

"আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: নবী সাল্লাল্লাহুসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করে দেখলেন ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এটি কোনো রোযা। তারা উত্তর দিল যে, এটি একটি বিরাট পবিত্র দিন। এদিনে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলকে তাদের শত্রুদের কবল থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। তাই মুসা আলাইহিস সালাম এ দিন রোযা রেখেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন: তাদের চেয়ে মুসা আলাইহিস সালামের সাথে আমার সম্পর্ক অধিক।

সুতরাং তিনি রোযা রাখলেন এবং সাহাবীদেরকে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন।" (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةَ وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ)بخارى(

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: আইয়ামে জাহেলিয়াতেও কুরাইশরা আশুরার রোযা রাখত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামও এ দিনে রোযা রাখতেন। মদিনায় হিজরত করে এসেও তিনি এ দিন রোযা রেখেছেন এবং লোকদেরকে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন। যখন রমাযানের রোযা রাখা ফরয করা হল তখন আশুরার রোযা ছেড়ে দিলেন। সতরাং তখন থেকে যার ইচ্ছে রোযা রাখত আর যার ইচ্ছা রোযা রাখা ছেড়ে দিত।" (বুখারী) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে,

حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আশুরার রোযা রাখলেন এবং রোযা রাখার আদেশ দিলেন, তখন সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এটি তো এমন একটি দিন, যাতে ইয়াহুদ-নাসারারাও সম্মান করে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: আগামী বছর ইনশা-আল্লাহ্ নয় তারিখেও রোযা রাখবো। কিন্তু আগামী বছর আসার আগেই তিনি মারা যান। (বুখারী)

১৮. হুসাইনের ভাষণই প্রমাণ করে যে ইয়াযীদ তাঁর হত্যার জন্য সরাসরি দায়ী নয়:

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহত হওয়ার পূর্বে ইরাকবাসীদেরকে ডেকে বলেছেন: তোমরা কি পত্রের মাধ্যমে আমাকে এখানে আসতে আহবান করো নি? আমাকে সাহায্য করার ওয়াদা করো নি? অকল্যাণ হোক তোমাদের! যেই অস্ত্র দিয়ে আমরা ও তোমরা মিলে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি এখন সেই অস্ত্র তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে চালাতে যাচ্ছ। মাছি যেমন উড়ে যায় তেমনি তোমরা আমার পক্ষে কৃত বাই'আত থেকে

সরে যাচ্ছ, পোঁকা-মাকড়ের ন্যায় তোমরা উড়ে যাচ্ছ এবং সকল ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ। ধ্বংস হোক এই উম্মতের তাগুতের দলেরা! (দেখুন, শিয়া লেখক তাবারসী এর 'আল-ইহতেজাজ')
ইমাম হুসাইনের এই ভাষণের কোনো স্থানেই তিনি ইয়াযীদকে দায়ী করেন নি। ঘুরেফিরে ভাষণটি এই কথার প্রমাণ করে যে, তাঁর করুন পরিস্থিতির জন্য ইরাকবাসীগণই।

অতঃপর হুর ইবন ইয়াযীদ নামক হুসাইনের একজন সমর্থক কারবালার প্রান্তরে দাড়িয়ে ইরাকবাসী সৈনিকদেরকে ডাক দিয়ে বললেন: তোমরা কি এই নেককার বান্দাকে এখানে আসতে আহবান করো নি? তিনি যখন তোমাদের কাছে এসেছেন তখন তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছ এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য তাঁর শত্রুতে
পরিণত হয়েছ। আর তিনি এখন তোমাদের হাতে বন্দী হয়েছেন। আল্লাহ যেন কিয়ামতের দিন তোমাদের পিপাসা না মেটান এবং তার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন! (দেখুন: إعلام
الإرشاد للمفيد 208 ،

الهدى

بأعلام

الور

এই পর্যায়ে হুসাইন তাঁর পূর্বের সমর্থকদের বিরুদ্ধে একটি বদদো'আ করলেন। তিনি বলেন:

اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقاً أي شيعاً وأحزاباً واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا ، فإنهم دعونا لينصرونا ، ثم عدوا علينا فقتلونا

انظر الإرشاد للمفيد ٢٤١، إعلام الورى للطبرسي ٩٤٩، كشف الغمة ١٨/٢، و ٣٨.

"হে আল্লাহ! আপনি যদি তাদের হায়াত দীর্ঘ করেন, তাহলে তাদের দলের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে দিন। তাদেরকে দলে দলে বিচ্ছিন্ন করে দিন। তাদের শাসকদেরকে তাদের উপর কখনই সন্তুষ্ট করবেন না। তারা আমাদেরকে সাহায্য করবে বলে ডেকে এনেছে। অতঃপর আমাদেরকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছে। হুসাইনের এই দো'আ প্রমাণ

করে যে, ইয়াযীদ প্রত্যক্ষভাবে হুসাইনের হত্যায় জড়িত ছিল না। কেননা তিনি দো'আয় বলেছেন: হে আল্লাহ! আপনি তাদের শাসকদেরকে তাদের উপর কখনই সন্তুষ্ট করবেন না। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ইরাকবাসীগণ (শিয়াগণ) উমাইয়া শাসকদের সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় হুসাইনের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে এবং তাঁর সাথে খেয়ানত করেছে। বাস্তবে তাই হয়েছে। পরবর্তীতে উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদকেও নির্মম ও নিকৃিষ্টভাবে হত্যা করা হয়েছে।

১৯. হুসাইনের হত্যাকারী নির্ধারণে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত:

ইবনে আবী নু'ম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন:

كُنتُ شَاهِدًا لابْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا

আমি একদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন একজন লোক তাঁকে ইহরাম অবস্থায় মশা হত্যা করার হুকুম জানতে চাইল। তিনি তখন লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কোনো দেশের লোক? সে বলল: ইরাকের। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা এই লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর। সে আমাকে মশা হত্যা করার হুকুম জিজ্ঞেস করছে। অথচ তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতিকে হত্যা করেছে। আর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এরা দুজন (হাসান ও হুসাইন) আমার দুনিয়ার দুটি ফুল। (বুখারী, হাদীছ নং- ৫৯৯৪)

অন্য বর্ণনায় মশার স্থলে মাছির কথা এসেছে।

২০. তাহলে কে হুসাইনকে হত্যা করল:

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কে হুসাইনকে হত্যা করল। সুন্নি মুসলিমগণ? আমীর মু'আওয়িয়া? ইয়াযীদ ইবন মু'আওয়িয়া? না অন্য কেউ?
উত্তরটি মেনে নেওয়া অনেক মুসলিমের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হলেও তা প্রকাশ না করে পারছি না। প্রকৃত ও সঠিক তথ্য হল শিয়াদের একাধিক কিতাব বলছে যে, শিয়ারাই (ইরাকবাসীরাই) হুসাইনকে হত্যা করেছে।

সায়্যেদ মুহসিন আল-আমীন বলেন: বিশ হাজার ইরাকবাসী

হুসাইনের পক্ষে বাই'আত নেয়। পরবর্তীতে তারা তাঁর সাথে খেয়ানত করেছে, তাঁর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছে এবং তাঁকে হত্যা করেছে। (দেখুন: আ'ইয়ানুশ শিয়া ১/৩৪)

২১. হুসাইনের হত্যায় ইয়াযীদ কতটুকু দায়ী?

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকের ঐকমত্যে ইয়াযীদ ইবন মু'আওয়িয়া হুসাইনকে হত্যার আদেশ দেন নি। বরং তিনি উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদকে চিঠির মাধ্যমে আদেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন ইরাকের জমিনে হুসাইনকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বাঁধা দেন। এতটুকুই ছিল তার ভূমিকা। বিশুদ্ধ মতে তার কাছে যখন হুসাইন নিহত হওয়ার খবর পৌঁছল তখন তিনি আফসোস করেছেন। ইয়াযীদের বাড়িতে কান্নার ছাপ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি হুসাইন পরিবারের কোনো মহিলাকে বন্দী বা দাসীতে পরিণত করেন নি; বরং পরিবারের সকল সদস্যকে সম্মান করেছেন। সসম্মানে হুসাইন পরিবারের জীবিত সদস্যদেরকে মদিনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন।

যে সমস্ত বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ইয়াযীদ আহলে বাইতের মহিলাদেরকে অপদস্থ করেছেন এবং তাদেরকে বন্দী করে দামেস্কে নিয়ে বেইজ্জতি করেছেন, তার কোনো ভিত্তি নেই। বনী উমাইয়াগন বনী হাশেমকে খুব সম্মান করতেন। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ যখন ফাতেমা বিনতে আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফরকে বিয়ে করলেন তখন আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান এই বিয়ে মেনে নেন নি। তিনি হাজ্জাজকে বিয়ে বিচ্ছিন্ন করার আদেশ

দিয়েছেন। শুধু তাই নয় হুসাইন হত্যার জন্য দায়ী উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের কাছে যখন হুসাইনের পরিবারের মহিলাদেরকে উপস্থিত করা হল তখন তিনি আলাদাভাবে তাদের জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করলেন এবং তাদের ভরণ-পোষণ ও পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করলেন। (ইবনে জারীর হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)

ঐতিহাসিক ইজ্জত দাররুযা বলেন: হুসাইন হত্যার জন্য ইয়াযীদকে

সরাসরি দায়ী করার কোনো দলীল নেই। তিনি তাঁকে হত্যার আদেশ দেন নি। তিনি যেই আদেশ দিয়েছেন, তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে, তাঁকে ঘেরাও করা হোক এবং তিনি যতক্ষণ যুদ্ধ না করবেন ততক্ষণ যেন তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করা হয়।

ইমাম ইবনে কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন: এটি প্রায় নিশ্চিত যে

ইয়াযীদ যদি হুসাইনকে জীবিত পেতেন, তাহলে তাঁকে হত্যা করতেন না। তাঁর পিতা মু'আওয়িয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে এ মর্মে অসীয়তও করেছিলেন। ইয়াযীদ এই কথাটি সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা

করেছিলেন।।

২২. ইয়াযীদ সম্পর্কে একজন মুসলিমের ধারণা কেমন হওয়া উচিত:

তাফসীর, হাদীছ, আকীদা, এবং ইতিহাস ও জীবনীর কিতাবগুলো অধ্যয়ন করে যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে দেখা যায় সালাফে সালেহীনের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং অনুকরণীয় কোনো ইমামের কিতাবে ইয়াযীদের উপর লা'নত করা বৈধ হওয়ার কথা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি। কেউ তার নামের শেষে রাহিমাহুল্লাহ বা লা'আনা হুল্লাহ- এ দু'টি বাক্যের কোনোটিই উল্লেখ করেন নি।

সুতরাং তিনি যেহেতু তার আমল নিয়ে চলে গেছেন, তাই তার ব্যাপারে আমাদের জবান দরাজ করা ঠিক নয়। তাকে গালাগালি করাতে আমাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু অর্জিত হবে না। তার আমল নিয়ে তিনি চলে গেছেন। আমাদের আমলের হিসাব আমাদেরকেই

দিতে হবে। তার ভাল মন্দ আমলের হিসাব তিনিই দিবেন। ইমাম যাহাবী ইয়াযীদের ব্যাপারে বলেন:

لا نسبه ولا نحبه

অর্থাৎ "আমরা তাকে গালি দিবো না এবং ভালও বাসবো না।" মদ পান করা, বানর নিয়ে খেলা করা, ফাহেশা কাজ করা এবং আরও যে সমস্ত পাপ কাজের অপবাদ ইয়াযীদের প্রতি দেওয়া হয়, তা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। তবে তাঁর চেয়ে হুসাইন যে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।সুতরাং ইয়াযীদ মুসলিম ছিলেন। তার জীবনের শেষ মুহূর্তে আমরা যেহেতু উপস্থিত ছিলাম না, তাই তার ব্যাপারটি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াই অধিক নিরাপদ। তা ছাড়া বুখারী শরীফের একটি হাদীছে তার ক্ষমা পাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে আছে যে,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমার উম্মতের একটি দল কুস্তুনতীনিয়ায় (কনস্টান্টিনোপল) যুদ্ধ করবে তাদেরকে ক্ষমা করা দেওয়া হবে। জানা যাচ্ছে, ইয়াযীদ ইবন মু'আওয়িয়া ছিলেন সেই যুদ্ধের সেনাপতি। আর হুসাইন তাতে সাধারণ সৈনিক হিসেবে শরীক ছিলেন। সুতরাং ইয়াযীদও ক্ষমায় শামিল হতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন।

২৩. মুসলিম বিশ্বে কারবালার ঘটনার প্রভাব:

কারবালার ঘটনা ইসলামী সমাজে এত অধিক গুরুত্ব পেয়েছে যে কারনে, তা হলো মুসলমান মাত্রই জালিমের রিরুদ্ধে, ইসলামী খিলাফতের পক্ষে। কারবালার এ ঘটনা মুসলমানদের জেগে উঠার প্রেরণা যোগায় বলে এ যুগের নব্য জালিম শাসকেরা বড়ই বিচলিত। এ কথা ঠিক যে, কারো মৃত্যুর জন্য মাতম করার রীতি ইসলাম সমর্থণ করে না। এটা বিদআত। অনেকেই না জেনে সেটা করেন। শিয়া নামধারী কিছূ লোকজন এই সব করেন বলেই ইয়াজিদের সমর্থকদের পোয়াবারো হয়। তারা উছিলা পেয়ে যায় কারবালার ঘটনাকে শিরক বিদআত বলার। কিন্তু সে কারনে কারবালার ইতিহাস মলিন হওয়ার নয়। ইসলামের ইতিহাসে অনেক দুঃখজনক হত্যাকান্ড ঘটেছে, কিন্তু কারবালার ঘটনা এতই নৃশংস যে মানুষের হৃদয়কে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয়। তার শাহাদাত এমন

এক অসাধারণ ও অদ্বিতীয় শাহাদাত এবং এমন এক হৃদয় বিদারক ঘটনা, আগের এবং পরের যুগে যার কোন নজীর নেই। এত দীর্ঘস্থায়ী ও এত ব্যাপক শোক, কান্না ও আহাজারি মুসলিম জাতি আর কোন শাহাদাতের জন্য করেনি। মুসলমানদের এই শোক, এই কান্না এই প্রতিবাদ মুসলিম বিশ্বের উপর চেপে বসা নব্য ইয়াজিদদের হৃদয়ে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। তা নইলে ইয়াজিদের পক্ষে তারা ইতিহাস বিকৃতিতে এমন মরিয়া হয়ে মাঠে নামছে কেন? কেন মহানবীর কলিজার টুকরা ইমাম হুসাইন(রা)কে হকের পক্ষে ছিলেন না বলে ইনিয়ে বিনিয়ে বলে মানুষকে তা হজম করাবার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে? কারবালার ঘটনাকে মানুষ কেন এতো গুরুত্ব দিচ্ছে তা নিয়ে মাথা খুটে মরছে। তারা ভাল করেই জানে, কারবালার ঘটনা মানুষকে জালিমের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবার প্রেরণা দেয়। কারবালার ইতিহাস সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্যে ব্যাপক শিক্ষণীয় ইতিহাস। অত্যাচারী শাসন শোষনের বিরুদ্ধে ইমানী শক্তিতে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে যাবার ইতিহাস। সৎ কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা আর অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার জ্বলন্ত উদাহরণ সৃষ্টির ইতিহাস। এই ইতিহাসে আরো যেসব নেতিবাচক প্রসঙ্গ ছিল তার একটি ছিল ইমামের সাথে দেওয়া জনগণের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। যার ফলে ইমামের দূত মুসলিম একাকী নিঃসঙ্গ হয়ে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তারপরও ইমাম তাঁর গতিপথ পরিবর্তন করেন নি।

২৪. হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ:

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকান্ডে জড়িত প্রধান খুনিদের একজন আমর ইবনু হাজ্জাজ যুবাইদি। সে মুখতারের কাছ থেকে লুকিয়ে দেশ ছাড়তে চেয়েছিল। তখন সে ছিল প্রচণ্ড পিপাসায় কাতর। এ অবস্থায় তাকে ধরে জবাই করা হয়।

শিমর ইবনু জিল জাওশান। সেও ছিল হুসাইনের হত্যাকারীদের প্রধান খুনি। তাকেও ধরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তারপর তার মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে নিক্ষেপ করা হয় কুকুরের সামনে।আব্দুল্লাহ ইবনু উসাইদ জুধানি, মালিক ইবনু বাশির, যামল ইবনু মালিককে বন্দি করা হয়। তারা প্রাণভয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে থাকে।

মুখতার বলেন, 'পাষণ্ডরা, তোরা তো আল্লাহর বাসুলের সৌরিত্রের ওপরন্ত দয়া দেখাসনি; এখন তোদের ওপর কীভাবে সয়া দেখানো যেতে পারে?'

তাদের সবাইকে এক এক করে হত্যা করা হয়। মালিক ইবনু বাশির হুসাইন রাযিয়াল্লায় আনহুর টুপি মাথা থেকে ফেলে দিয়েছিল। তার হাত-পা কেটে ছুড়ে ফেলা হয়। এভাবে ছটফট করতে করতে মারা যায় সে।

উসমান ইবনু খালিদ ও বিশর ইবনু সামিত মুসলিম ইবনু আকিলকে হত্যা করতে সহায়তা করেছিল। তাদেরকে হত্যা করে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

উমার ইবনু সাদ, হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিপক্ষের প্রধান ছিল সে। তাকে হত্যা করে তার মাথা আলাদা করে ফেলা হয়। তারপর এ কর্তিত মাথা এনে রাখা হয় মুখতারের সামনে।

উমার ইবনু সাদের ছেলে হাফসকে আগ থেকেই দরবারে বসিয়ে রাখেন মুখতার। যখন ইবনু সাদের মাথা দরবারে নিয়ে আসা হয়, তখন মুখতার হাফসকে লক্ষ্য করে বলেন, 'জানো, এই কর্তিত মাথাটি কার?'

হাফস বলে, 'জানি। এখন আমার বেঁচে থাকা মূল্যহীন।'

তারপর তাকেও হত্যা করে ফেলা হয়।

মুখতার বলেন, 'উমার ইবনু সাদকে তো হুসাইনের শাহাদাতের প্রতিশোধে হত্যা করা হয়েছে। আর হাফসকে হত্যা করা হলো আলি ইবনু হুসাইনের বদলায়। তবুও ন্যায়বিচার সম্ভব হয়নি। বাস্তবতাও এটাই। যদি আমি কুরাইশদের চার ভাগের তিন ভাগকেও হুসাইনের বদলায় হত্যা করে ফেলি, তবু তার একটি আঙুলের বদলাও নেওয়া হবে না।'

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তির মেরেছিল হাকিম ইবনু তুফাইল। তিরে তিরে ঝাঁজরা করে ফেলা হয় তার শরীর। এভাবেই মারা যায় সে।

যাইদ ইবনু রিফাদ, মুসলিম ইবনু আকিলের ছেলে আব্দুল্লাহকে তির মেরে শহিদ করেছিল। কপাল বরাবর তির মারায় হাত দিয়ে কপাল ঢেকে ফেলেছিলেন ইবনু মুসলিম। তবুও রক্ষা হয়নি। হাত ভেদ করে তির কপালে গেঁথে যায়। হাতও আটকে

যায় কপালের সাথে।এবার যাইদ ইবনু রিফাদকে বন্দি করে প্রথমে তির মারা হয়, পরে পাথর। তখনো সে মারা যায়নি। সেই অবস্থায়ই জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তাকে।

সুনান ইবনু আনাস, হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাথা দ্বিখণ্ডিত করেছিল এই পাপিষ্ঠ নরাধম। সে এ ধরপাকড়ের সময় পালিয়ে যায়। তাকে না পেয়ে তার বাড়িঘর ধ্বংস করে ফেলা হয়।।

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের এমন করুণ পরিণতি দেখে আপনাআপনি এ আয়াতটি মুখে চলে আসে-

(كَذَلِكَ الْعَذَابُ ، وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

শাস্তি এমনই হয়ে থাকে। আখিরাতের শাস্তি তো আরও ভয়াবহ। যদি তারা জানত!

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, ইবনুল আসির, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩০২-৩১৪

[২] সুরা কলম, আয়াত: ৩৩

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৩২২

[৪] দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা: ৪৬৬

হুসাইনের মৃত্যু নিয়ে লোকেরা তিনভাগে বিভক্ত:

একদলের মতে, তিনি অন্যায়ভাবে মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য ইয়াযীদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাই তাঁকে হত্যা করা সঠিক ছিল। তারা বুখারী শরীফের এই হাদীছ দিয়ে দলীল দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه

"একজন শাসকের সাথে তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যদি তোমাদের জামা'আতে বিভক্তি সৃষ্টির জন্য কেউ আগমন করে তবে তাকে হত্যা করো।" (বুখারী) তারা বলেন: মুসলিমরা ইয়াযীদের শাসনের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। হুসাইন এসে সেই ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করেছেন। সুতরাং তাঁকে হত্যা করা যুক্তিসংগত হয়েছে।

অন্যদল মনে করেন হুসাইনই ছিলেন খেলাফতের একমাত্র হকদার। তাঁর আনুগত্য করা ব্যতীত অন্য কারও অনুসরণ করা বৈধ ছিল না। জামা'আত, জুমআসহ ইসলামের কোনো কাজই তাঁর পিছনে বা তাঁর নিয়োগ কৃত প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কারও অনুসরণ করে সম্পাদন করলে তা বাতিল হবে। এমন কি তাঁর অনুমতি ব্যতীত শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাও বৈধ ছিল না। এমনি আরও অনেক কথা। এই দলের কথার সমর্থনে কোনো সুস্পষ্ট দলীল খুঁজে পাওয়া যায় নি।

আর উপরোক্ত উভয় দলের মাঝখানে হচ্ছে আহলে সুন্নত ওয়াল চর মাজহাব। তাঁরা উপরের দুটি মতের কোনটিকেই সমর্থন করেন না। বরং তাঁরা বলেন: হুসাইন মজলুম ও শহীদ অবস্থায় নিহত হয়েছেন। তিনি মুসলিম জাতির নির্বাচিত আমীর বা খলীফা ছিলেন না। সুতরাং দ্বিতীয় মতের পোষণকারীদের কথা ঠিক নয়।

আর যারা বুখারী শরীফের হাদিছকে দলীল হিসেবে পেশ করে হুসাইনকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার কথা বলে থাকেন তাদের দলীল গ্রহণ সঠিক নয়। হাদীছ কোনোভাবেই তাদের কথাকে সমর্থন করে না। কারণ তিনি যখন তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম ইবন আকীলের চিঠি পেলেন তখন খেলাফতের দাবী ছেড়ে দিয়ে ইয়াযীদের সৈনিকদের কাছে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেছেন:

সিরিয়ায় গিয়ে তাঁকে ইয়াযীদের সাথে সাক্ষাত করতে দেওয়া হোক।

অথবা তাকে মুসলিম রাজ্যের কোনো সীমান্তের দিকে যেতে দেওয়া হোক।

অথবা তাঁকে মদিনায় ফেরত যেতে দেওয়া হোক। কিন্তু তারা কোনো প্রস্তাবই মেনে নেয় নি। বরং তারা তাঁকে আত্মসমর্পণ করে তাদের হাতে বন্দী হওয়ার প্রস্তাব করল। অস্ত্র

ফেলে দিয়ে তাদের পাল্টা প্রস্তাব মেনে নেওয়া হুসাইনের উপর মোটেই ওয়াজিব ছিল না। সুতরাং তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করাকেই বেছে নিলেন এবং ইয়াযীদের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করে শাহাদাত বরণ করলেন।

পরিশেষে বলতে চাই যে, হুসাইনের মৃত্যু ও কারবালার ঘটনা নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা কোনো মুসলিমের কাজ হতে পারে না। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে অন্যান্য মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড থেকে আলাদা কোনো ঘটনা নয়। এ জাতীয় সকল ঘটনাকে সমানভাবে মূল্যায়ন করা উচিত। বিষাদসিন্ধু মুসলিমদের কোনো মূলনীতির গ্রন্থ নয়। এটি একটি কাল্পনিক উপন্যাস মাত্র। তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম জাতি ঐতিহাসিকভাবে একটি প্রমাণিত সত্যকে বাদ দিয়ে কাল্পনিক কাহিনীকে কখনই সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না।
যারা জালিম এবং আল্লাহর অবাধ্য, এমন লোকদের ক্ষমতার দাপট কখনোই স্থায়ী হয় না। তাদের অবস্থা দেখে মনে হতে পারে, অন্যায় ও জুলুমের বুঝি বিজয় হয়েছে। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়-এর সবই মরীচিকা; যা চোখের পলকে শেষ হয়ে যায়।

জালিম কখনোই বিজয় লাভ করতে পারে না। যার প্রতি সে জুলুম করে এবং যার সাথে করে অন্যায় আচরণ; মূলত এর দ্বারা সে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

কারবালার প্রান্তরে জালিমরা যাদেরকে হত্যা করেছে, পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দিতে চেয়েছে যাদের নাম-তারা আজও অমর; কিয়ামত পর্যন্ত অমর হয়ে থাকবে। ঘরে ঘরে এখনো তাদের আলোচনা হয়। শত শত বছর চলে গেছে, এখনো তারা বেঁচে আছে কোটি মানুষের হৃদয়ে। অগণিত মানুষ তাদের নামে বিলিয়ে দিয়েছে নিজেদের জীবন। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকে মনে করছে জীবনের অন্যতম লক্ষ্য।

এ ঘটনায় একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বে সত্যই চিরন্তনবিজয় লাভ করে। যা কুরআনুল কারিমের এ আয়াতটি থেকে বোঝা যায়-

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ .

নিশ্চয় মুত্তাকিদের জন্যই শুভ পরিণাম।এ

খারা ক্ষমতার ছড়ি হাতে পেয়ে, নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করে বেপরোয়া হয়ে ওঠে: চালিয়ে যায় সীমাহীন জুলুম-অত্যাচার, ন্যায়কে মিটিয়ে ফেলতে চায়-এ ঘটনায় তাদের জন্য রয়েছে শিক্ষার অপার উপকরণ।

সবশেষে মনে রাখতে হবে-সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে কখনো যদি সত্যের আওয়াজ তিমিত হয়ে যায়, যদি সত্যপন্থিরা পরাজিতও হয় কখনো; তবুও সত্য কখনো মিথ্যা হয়ে যায় না। মিথ্যা চিরদিনই মিথ্যা; তার বিনাশ অনিবার্য। আর সত্য চিরন্তন; তার কোনো ক্ষয় নেই। শত ঝড়ঝাপটা সয়েও সত্য টিকে থাকে; সত্যেরই জয় হয় সবসময়।

জ্ঞানীরা যেন এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। কুরআনের ভাষায় বলতে চাই-

فَاعْتَبِرُوا يَأُولِي الْأَبْصَارِ .

হে দৃষ্টিমান মানুষেরা, তোমার উপদেশ গ্রহণ করো
[১] সুরা হুদ, আয়াত: ৪৯

[২] সুরা হাশর, আয়াত: ২

هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين